Living the Lotus
Buddhism in Everyday Life
New Year's Issue

ইতিহাস ও ঐতিয্যের প্রতি সম্মান রেখে এগিয়ে চলা

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

শতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, সকল সদস্যগণ একাত্ম হয়ে ছোট শিশু ও তরুণদের লালন-পালনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা --

শুভ নববর্ষ।

আসুন, এই বছরও প্রতিদিন একেবারে নতুন ও নির্মল মন নিয়ে, নবোদ্যমে ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করি।

জাপানি ভাষায় "নতুন" অক্ষরটি 'কষ্ট' 'বৃক্ষ' ও 'কুঠার' এই তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত। এখানে "কষ্টদায়ক" বলতে সাধনা ও পরিশ্রম; 'বৃক্ষ' হলো গাছ; আর "কুঠার" হলো কাঠ কাটার জন্য ব্যবহৃত বড় কুঠার। অর্থাৎ, এই অক্ষরের মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর তাৎপর্য— গাছকে যত্নসহকারে লালন করা, পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা এবং তা সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানো। নতুন মানে শুধু পরিবর্তন নয়—নতুন মানে সাধনার মধ্য দিয়ে রূপান্তর, কষ্টের ভেতর দিয়ে বিকাশ এবং জীবনকে আরও অর্থবহ করে তোলার এক নবযাত্রা।

মানবসমাজের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনার অর্থ হলো—পূর্বপুরুষদের গড়ে তোলা ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অধ্যয়ন ও সম্মান করা, এবং বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে, সমস্ত শক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে নতুন কিছু নির্মাণ করা। "নতুন" অক্ষরের মধ্যে নিহিত এই তাৎপর্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, চলুন আমরা সকলে একসঙ্গে এই বছর ধর্মপথে অগ্রসর হই।

এবার আমি "২০২৬ সালের ধর্মনীতি"র রূপরেখা উপস্থাপন করছি।

গত বছর জাপানে "শোওয়া যুগের একশো বছর" হিসেবে স্মরণ করা হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সংস্থা আরও বারো বছর পর, অর্থাৎ ২০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তার গৌরবময় শতবর্ষ উদ্‌যাপন করবে। এই সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, আসুন এই বছরও আমরা ধর্মের আলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্যম ও সহযোগিতার চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলি।

আসুন আমরা চিন্তা করি—কীভাবে শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে মানবতার ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, কীভাবে তাদের চরিত্র ও মানবগঠনে সহায়তা করা যায়, কীভাবে পরিবারে শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং কীভাবে জাপানের ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে ধারণ করে একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ জাতি গঠনে অবদান রাখা যায়।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে, আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠার আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে, আসন্ন শতবর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বলেছিলাম—মানুষকে গড়ে তোলা ও লালন করা এই মৌলিক কর্তব্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ভবিষ্যৎ সমাজের ভার বহনকারী শিশু ও যুবকদের কীভাবে মানবতার পথে—অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের পথে—পরিচালিত করা যায় এবং কীভাবে তাদের সুস্থ, পূর্ণাঙ্গ মানবিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করা যায়, তা কেবল আমাদের সংস্থারই নয়, সমগ্র সমাজের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদের সকলেই জানেন, আমাদের সংস্থার মূল নীতি হলো "পরিবারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংহত করা", কারণ পরিবারই মানুষের চরিত্র ও মানবিকতা গঠনের প্রধান ক্ষেত্র। পিতা-মাতা যদি গৃহে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করেন এবং সদা প্রফুল্ল, সদয় ও উষ্ণ মনোভাব ধারণ করেন, তবে তা শিশুদের চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে।

এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—শৈশব ও কৈশোরকাল থেকেই পরিবারভিত্তিক শিক্ষা। কারণ জীবনের এই প্রাথমিক সময়ে মানুষের চরিত্র, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বীজ বপিত হয়।

"সাত-পাঁচ-তিন" বা 'শিচি-গো-সান' জাপানের এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সাত, পাঁচ ও তিন বছরের বয়সকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ এটি স্কুলে প্রবেশের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন পারিবারিক শিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দশ থেকে তেরো বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মন সবচেয়ে সতেজ, বিশুদ্ধ ও তীক্ষ্ণ থাকে। নয় থেকে দশ বছরের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। অভিভাবকরা প্রায়শই বলেন, "এই শিশুটি এত মনোযোগ দিয়ে দেখে যে, যেন চোখে ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়।" এগারো বা বারো বছরের মধ্যে কল্পনাশক্তি, যুক্তি ও স্মৃতিশক্তি সর্বাধিক প্রবল হয়। পনেরো বা ষোল বছর বয়সে শিশুটি পূর্ণাঙ্গ, মর্যাদাশীল ও সুসংহত মানুষে পরিণত হয়।

এই সময়ে যদি পারিবারিক শিক্ষা যথাযথভাবে প্রদান না হয় এবং সবকিছু শুধুই স্কুলের উপর নির্ভর করা হয়, তাহলে তরুণ প্রজন্মের সঠিক মানবিক বিকাশ আশা করা কঠিন। শিশু ও কিশোরদের আশেপাশের নানা সামাজিক সমস্যাও শেষ পর্যন্ত পিতামাতার সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল।

এমনও বলা হয়ে থাকে, "রাজনীতি ও অর্থনীতির অস্তিত্ব কেবল তরুণদের শিক্ষিত করার জন্যই।" অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব হলো এমন একটি সমাজ তৈরি করা যা তরুণ প্রজন্মের সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সহায়ক।

তরুণদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিজেদের দেশে গর্ব নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে। যদি তারা দেশকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করতে শেখে, তবে তাদের মানবিক ও নৈতিক বিকাশও স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যাবে।

সংস্থার যাত্রাস্থলে নির্মিত দোজো-এর বুদ্ধের আসনের সামনে

এই ধর্মচর্চাকেন্দ্রটি ১৯৪৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৪ সালে মূলমন্দির (গ্রেটসেক্রেট হল) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটিই ছিল অত্রসংস্থার প্রধান কেন্দ্র। ১৯৯৪ সালে মূলমন্দির প্রতিষ্ঠার ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এর নাম পরিবর্তন করে 'প্রশিক্ষণকেন্দ্র' নামকরণ করা হলেও, আজও সদস্যদের কাছে এটি "পুরনো মূলমন্দির" নামে পরিচিত এবং বহু মানুষের জন্য এটি এক গভীর মানসিক আশ্রয়ের স্থান হয়ে আছে।২০১১ সালে পূর্ব জাপানের ভূমিকম্পের পর, ভবনটির ভূমিকম্প-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা হয়। সেই সময়ে, অতীতের সাধনা ও অনুশীলনের আবহ দর্শনার্থীরা যেন অনুভব করতে পারেন—এই অভিপ্রায়ে, ১৯৬৩ সালে "গ্রেটসেক্রেট হল" এর এয়ুজুদেন হলে সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠাতার নিজ হাতে অঙ্কিত 'মহা-মান্দারা' (মহামণ্ডল)-এর একটি প্রতিলিপি এখানকার বুদ্ধের আসনে স্থাপন করা হয়।

বিশেষ করে জাপান এমন একটি দেশ যা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। বিশ্বের অতুলনীয় সম্রাট ও সম্রাজ্য পরিবারের নেতৃত্বে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকেরা ঐক্যবদ্ধ থেকে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছেন।

প্রাচীনকালে জাপান দেশটির নামকরণ করেছিল "ইয়ামাতো", যার অর্থ "মহান সম্প্রীতি"। সেই ধারাবাহিকতায় "মহান সম্প্রীতি" ও "মহান ঐক্য" বজায় রাখাকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজকুমার শোওতকু তাঁর ১৭ ধারা বিশিষ্ট সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন—"সম্প্রীতি সহকারে কাজ করা উচিত।"

শান্তি ও ঐক্যের এই মূল্যবোধকে ধারণ করে, জাপানের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে একটি মর্যাদাপূর্ণ দেশ গড়ে তোলা "মানুষ গড়ার" দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, ১২ বছর পর আমাদের সংস্থার ১০০তম বার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, আমি আশা করি সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে শিশু ও তরুণদের লালন-পালনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

কৃতজ্ঞতাবোধ ও জীবনের গভীর মূল্যবোধকে হৃদয়ে ধারণ করে বোধিসত্ত্বের পথে চলাই ছিল শাক্যমুনি বুদ্ধের একান্ত অভিপ্রায়।

গত বছর আমি জাপানি প্রথা অনুযায়ী গণনায় আটাশি বছর পূর্ণ করে "বেইজু"—অর্থাৎ আশি-আট বছরের শুভ উপলক্ষ—উদ্‌যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে ২০শে মার্চকে সূচনা করে মোট আটবার মূলমন্দিরে আমার জন্মোৎসব উপলক্ষে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেই সমাবেশগুলির মধ্যে যখনই কোনো সদস্যের মুখে শুনেছি—"কোসেই-কাই-এ যোগদান করে আমি সত্যিই আনন্দিত"—প্রতিবারই মনে হয়েছে, যেন আমিও নতুন করে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করছি। তখন হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করেছি—কোসেই-কাই-এর সদস্য হিসেবে আমরা সবাই একে অপরের সহযোগিতায় ধাপে ধাপে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছি। আর সারা দেশ থেকে যেন আত্মীয়স্বজনেরা একত্রিত হয়ে আমাকে ঘিরে এই আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন—এই অনুভূতিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আবেগাপ্রবণ করেছে।

কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মানুষেরই বয়স বাড়ে—এটাই প্রকৃতির অবিচল নিয়ম। অথচ তা সত্ত্বেও বহু মানুষ বার্ধক্যকে অপছন্দ করেন এবং একে এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু বলা হয়, যতক্ষণ কেউ বার্ধক্যকে অপছন্দ করে, ততক্ষণ সে আসলে এখনও পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি।

বার্ধক্য কেবল বয়সের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। এটি হলো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, চিন্তা ও মননের গভীরতা অর্জন করা, এবং নিজের চরিত্রকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ করে তোলার এক প্রক্রিয়া। আমাদের শেখানো হয়েছে যে—এই পথচলাই মানুষের প্রকৃত স্বভাব, যেখানে জীবনের গভীর অর্থবোধ ও নীরব গৌরব ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

অবশ্যই, জীবনে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে বলা যায়—"এখানেই সব সম্পূর্ণ হয়েছে।" সুতরাং নিজেকে মানুষ হিসেবে আরও উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিরন্তর সাধনায় নিয়োজিত রাখতে হয়। মিয়াজাওয়া কেনজি এই সত্যকেই প্রকাশ করেছেন তাঁর সেই মূল্যবান উক্তিতে— "চিরন্তন অসম্পূর্ণতাই প্রকৃত পূর্ণতা।" এর অর্থ হলো, সহজেই 'সব বুঝে ফেলেছি' এরূপ ভাবা নয়; বরং আজীবন সত্যের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই মানুষের প্রকৃত পথ।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখি, আমিও তরুণ বয়সে কোসেই-কাই এর ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শাক্যমুনি বুদ্ধ আসলে আমাদের কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই শিক্ষাকে আমি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নয়, নিজের দেহ ও হৃদয়ের গভীর অনুভবের মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থেই

উপলব্ধি করতে শুরু করেছি।

ধম্মপদ-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক রয়েছে "মানবজন্মলাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপদপূর্ণ। সদ্ধর্ম শ্রবণ আয়াসসাধ্য; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে।"

আধুনিক পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়—মানুষ হিসেবে জীবন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, আর জন্ম গ্রহণ করলেই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী; তবু এই মুহূর্তে জীবিত থাকা এক বিরল সৌভাগ্য। আবার, মানবজীবন লাভ করলেও জীবদ্দশায় সত্য ও সদ্ধর্মের সংস্পর্শে আসা অত্যন্ত বিরল। তার ওপর, বুদ্ধের শিক্ষায় আলোকিত এই পৃথিবীতে—এই যুগে—জন্ম নেওয়া তো আরও মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

আমার কাছে মনে হয়, এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই শাক্যমুনি বুদ্ধের শিক্ষার সারসত্য নিহিত রয়েছে।

আমাদের জীবন কতখানি রহস্যময়, কতখানি মূল্যবান এবং কতখানি কৃতজ্ঞতার যোগ্য—এই সত্য উপলব্ধি করা; এবং বুদ্ধের ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া যে কতখানি দুর্লভ—এই বোধ জাগ্রত হলে আমরা জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

অসন্তোষ ও অভিযোগের মধ্যে জীবন কাটানোর পরিবর্তে, আমাদের যে অমূল্য জীবন দান করা হয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে এবং আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপন করা—সহজভাবে বলতে গেলে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা ও ধর্মের আলোকে যাপন করার অর্থ বোধহয় এটিই।

নিশ্চয়ই জীবনের সঙ্গে নানাবিধ দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও কষ্ট অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই মুহূর্তে আমরা কত অসংখ্য আশীর্বাদে পরিবেষ্টিত, তখন হতাশ না হয়ে সামনে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে জীবনযাত্রা এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়। এমনকি যেসব পরিস্থিতিকে আমরা এতদিন অসুবিধাজনক বা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেছি, সেগুলোর মধ্যেও ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞতার অর্থ খুঁজে পাই।

তদুপরি, আমাদের সকলের মধ্যেই বুদ্ধপ্রকৃতি বিদ্যমান। সত্য-ধর্মকে অনুধাবন করার ক্ষমতাও আমাদের আছে, আবার নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই খুঁজে নেওয়ার শক্তিও আমাদের রয়েছে।

অতএব, "আমি অযোগ্য মানুষ" "আমার পক্ষে সম্ভব নয়"—এই ধরনের চিন্তাধারায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে, একজন বৌদ্ধ হিসেবে শাক্যমুনি বুদ্ধের শিক্ষাকে সরল হৃদয়ে গ্রহণ করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করাই হলো সুখী জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রকৃত সূচনাবিন্দু।

এই মুহূর্তে আমি আমার হাত-পা নাড়াতে পারছি; শ্বাস নিতে পারছি, কথা বলতে পারছি, আহার করতে পারছি। জীবনের জন্য অপরিহার্য বাতাস ও জল আমার নিজস্ব সৃষ্টি নয়—এগুলো প্রকৃতির অমূল্য আশীর্বাদ। উপরন্তু, অসংখ্য মানুষের সহায়তা ও অবদানের মধ্যেই আমার জীবন টিকে আছে।

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বিষয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে সক্ষম মানুষ হয়ে ওঠা—আসলে সেটিই হলো সর্বোচ্চ ও পরম সুখ লাভ করার পথ।

মানুষরূপে আমরা এই জীবন লাভ করেছি, আর স্বর্গ-পৃথিবীসহ সমস্ত সৃষ্টিই আমাদের সমর্থন করে প্রতিক্ষণে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, জীবনের গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে বোধিসত্ত্বের পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। প্রথাগত জাপানি গণনা অনুযায়ী আজ ঊননব্বই বছরে উপনীত হয়ে আমি এই সত্যটি অন্তরের গভীর থেকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারছি।

এই উপলব্ধিকে যদি আমরা সকল অনুসারী একসঙ্গে হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ করতে পারি, তবে আমাদের জীবন নিঃসন্দেহে সত্যিকার অর্থেই অর্থবহ ও মহৎ হয়ে উঠবে।

দুই বছর পরে, আমাদের সংস্থা তার ৯০তম বার্ষিকী উদযাপন করবে, এবং ১২ বছর পরে, ২০৩৮ সালে, সংস্থার শতবর্ষ উদযাপন করা হবে।

ধর্মের আলোকে জীবনযাপনের মাধ্যমে, আমরা আশা করি পরিবারকে সুসংহত রেখে ছোট শিশু ও তরুণদের মানবিক চরিত্র গঠন এবং জাপানের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে শান্তিপূর্ণ জাতি গড়ার কাজকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কোসেই সংবাদপত্র, জানুয়ারী ২০২৬ইং।